চলচ্চিত্র তত্ত্ব

যে শুভলগ্নে সিনেমা বা চলমান ছবি তাঁবু আর ম্যাজিকের আসর ছাড়িয়ে শিল্পমাধ্যমের পরিবারের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল, সেদিন থেকেই শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন ধারা চলচ্চিত্রকেও সমৃদ্ধ করল। সাহিত্যের জগতে যেমন ক্লাসিকাল যুগ থেকে রোমান্টিসিজমের যুগ, তারপর নিও রোমান্টিসিজম আর বিশ শতক থেকে আধুনিকতা, বাস্তবতাবাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ, বা একেবারেই হালফিলের উত্তর আধুনিকতার নানা পর্যায়ক্রমিক ধারা আমরা চিহ্নিত করতে পারি, তেমনভাবেই চলচ্চিত্রেও এসেছে নানা মতবাদ। নানা তত্ত্ব।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা এই তত্ত্বগুলিরই আকার নিয়ে আলোচনা করব। জানি, এই প্রতিটি তত্ত্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনার যথাযথ দাবি রাখে। কিন্তু এখানে আমরা বিভিন্ন তত্ত্বগুলির রেখাচিত্র পাঠকদের সামনে রাখছি।

বিশের দশকে সদ্য বিপ্লব অতিক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে চলচ্চিত্র নিয়ে নানান পরীক্ষা চালিয়েছেন ভাসালোনভ এমিনিভিচ মেয়ারহোল্ডের ছাত্র আইজেনস্টাইন, ডবঝনকো, কুলেশভ, পুডভকিনরা। তাঁরা সে সুযোগ পেয়েছিলেন। কেননা, জারের আমলের স্টুডিও জাতীয়করণের দিনটি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের জন্য চলচ্চিত্র হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যম।" এই উক্তি সেই সময়ে, যখন হলিউড চলচ্চিত্রকে নিয়ে ফাটকা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। যখন হলিউড টাইকুন ওয়ার্নার ভাইরা প্রকাশ্যেই জানাচ্ছেন, সিনেমা শ্রেষ্ঠ বিনোদন মাধ্যম। লেনিনের কাছে চলচ্চিত্র বাণিজ্য করার নবতম মাধ্যম ছিল না। মানুষের কাছে নতুন সমাজের বাণী নিপুণতম পদ্ধতিতে পৌঁছে দেবার মাধ্যম। তাই সেদিনের দুর্ভিক্ষপীড়িত, দারিদ্রপীড়িত অনিশ্চিত অস্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি 'ওডেসা ফিল্ম স্টুডিও'-র জন্য প্রয়োজনীয় অর্থর ব্যবস্থা করেছিলেন। পৃথিবী পেল 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন', 'মাদার', 'আর্থ', 'ইভান দি টেলিবলের' মতো অমূল্য সম্পদ। আজ সোভিয়েত সাবেকে পর্যবসিত। দূর নীলিমায় বিলীন। কিন্তু মানুষের

Scanned by Scanner Go

সভ্যতা চিরদিনের জন্য ধনী থাকবে শিল্প, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ পথিকদের কাছে।

চলচ্চিত্রতত্ত্বের অবতারণা করার আগে এই পটভূমিকাকে স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন ছিল। এবার বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা।

জার্মান এক্সপ্রেশনিজম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পরাজিত জার্মানি, ভেঙেপড়া অর্থনীতি, তেজি মার্ক-এর পরিণতি এক পাউন্ডে উনিশ মার্ক। পরের সপ্তাহে হয়তো বা কাগজের মূল্য। কাইজার পলাতক, কিন্তু বড় বড় পুঁজিবাদীরা? তাঁরা তো থেকে গেলেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট আর সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের দোদুল্যমানতা। অন্যদিকে ব্ল্যাক শার্ট ব্রাউন শার্টদের প্রবল প্রভাব বৃদ্ধি। জার্মানির বড় ব্যবসায়ীরা তখন চলচ্চিত্র শিল্পে লগ্নি করতে শুরু করলেন। মূল লক্ষ্য আর শর্ত একটাই—ছবি ব্যবসায়ে লাভ আনবে কিন্তু সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবে না। সঙ্গে রইল নিৎসের সুপারম্যানের দর্শন।

এই পরিবেশেই জার্মান এক্সেপ্রেশনিজমের জন্ম। ইউরোপ জুড়ে তখন দাদাইজিম্, বা বস্তুবাদের বিমূর্ত অসুস্থ আন্দোলন। আর জার্মানিতে চলচ্চিত্র, চিত্রকলা শিল্পে এই মতবাদ সৃষ্টিই এক্সপ্রেশনিজমের জন্ম নিল।

উনিশশো কুড়ি সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানিতে একটি প্রচণ্ড বিতর্কিত ছবি তৈরি হয়। 'দি ক্যাবিনেট অব ডঃ ক্যালিগরি'। পরিচালক সেদিনের অতি বিখ্যাত নাম—রবার্ট ওয়াইন। ডঃ ক্যালিগ্যারি একজন ডাক্তার। একটি পাগলাগারদের পরিচালক। ডাক্তার তার সম্মোহিনী শক্তির মাধ্যমে এক রোগীকে দিয়ে এক নারীকে প্রথমে ধর্ষণ করান। পরে তার প্রেমিককে খুন করান। শেষ দৃশ্যে জানা গেল আসলে ঘটনাটি বাস্তবে ঘটেনি। বিকৃতমনস্ক ক্যালিগারির চিন্তামাত্র। কারিগরি ক্ষেত্রে ডঃ ক্যালিগারি সে যুগের এক যুগান্তকারী ছবি। সিনেমা পেয়েছিল ভাবপ্রকাশের অনেক নতুন মাধ্যম। ক্যামেরা চলাফেরা, আলোর রহস্যময়তা, ডিজলভ, ট্রাকশট, স্লো মোশানের বাস্তববাদী চিত্রায়ণ। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন থেকে এক্সসিস্ট— কলাকৌশলের উৎকর্ষের আকর্ষণীয়তার জন্য তারা অনেকটাই ঋণী জার্মান এক্সেপ্রেশনিস্টদের কাছে। কিন্তু ভাবের ঘরে বিষম বিপদ ডেকে আনে ডঃ ক্যালিগারি, শেষ দৃশ্যকে সরিয়ে রাখলে ছবিটি প্রচার করল বেশির ভাগ মানুষ অসহায়, তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ডঃ ক্যালিগারির মতো অতিমানুষ। জার্মানির বাস্তবতায় অ্যাডলফ্ হিটলার। মানুষকে প্রয়োজনে ধ্বংস করতে হবে। মানবতা বিরোধী বক্তব্যকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসা হল।

Scanned by Scanner Go

নব্য বস্তুবাদ

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ, পরাজিত মুসোলিনির রোমক সাম্রাজ্য। পরাজিত বিধ্বস্ত দেশ। বিধ্বস্ত শক্তিতে। বিধ্বস্ত মনোজগতে। ভেঙে পড়েছে স্টুডিও সিস্টেম। রোমের স্টুডিওগুলো বোমায় বোমায় প্রায় নিশ্চিহ্ন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ প্রচারের সরকারি সংস্থা Centro Sperienate di Cinematographia.

নতুন পরিচালকরা তখন নানা উপায়ে ছবি তৈরির কথা ভাবতে শুরু করলেন। রেনোয়াঁর সঙ্গে এক সময় কাজ করেছিলেন রবার্টো রসোলিনি।

Scanned by Scanner Go

স্টুডিও নিশ্চিহ্ন, নামী দামী শিল্পীরাও সোনা আর নিরাপত্তার সন্ধানে হলিউড পাড়ি দিয়েছেন। অনেকে আগে দেশত্যাগী। ফলে রসোলিনিকে শ্যুটিং করতে হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। কুশীলবরা অনামী, আমাদের দেশের মতই গ্রুপ থিয়েটারের তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। কিন্তু অসম্ভব সফল হল রসোলিনির 'রোম: ওপেন সিটি'। কেন? তার বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য। ঘটনা উনিশশো তেতাল্লিশের। এক মার্কসবাদী বিপ্লবীকে লুকিয়ে রেখেছিল এক ছাপাখানার মালিক ফ্রানসেসকো। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এক পাদ্রী। পরের দিন ফ্রানসেসকোর বিয়ে হবার কথা। অনেক দিনের প্রেমিকার সাথে। কিন্তু সে ধরা পড়ে তার আগেই। ফ্যাসিস্তরা তাকে রাস্তায় গুলি করে খুন করে। ধরা পড়েন পাদ্রীও। তাঁর স্থান হয় ফায়ারিং স্কোয়াডে। শেষে বিপ্লবীও ধরা পড়েন। ফ্যাসিস্তদের হাতে অত্যাচারে অত্যাচারে শহিদ হন।

ছবিটি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করেছিল। কেননা, মোহভঙ্গ, নির্যাতিত ইতালীয়দের কাছে ফ্যাসিস্তরা ছিল সবচেয়ে ঘৃণ্য। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট আর ক্যাথলিকরা যে প্রতিরোধ সংগ্রামের পাঁচিল তুলেছিল তার দলিল 'রোম : ওপেন সিটি'। নব্যবস্তুবাদের দর্শনও সাথে সাথে প্রচারিত হয়েছিল ছবিটিতে। দানবীয় শক্তির কাছে মানুষ অসহায়। কিন্তু আত্মিক শক্তিতে বলবান মানুষ সবকিছু হারিয়েও, ধ্বংস হয়েও পরাজিত হয় না। হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি'র অমোঘ উক্তি 'মানুষ ধ্বংস হতে পারে। কিন্তু পরাজিত হবে না কোনোদিন।'

প্রয়োজনের তাগিদে নতুন ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল রসোলিনিকে। কিন্তু নিজের অজান্তেই এক নতুন যুগের সূচনা করলেন তিনি। নতুন মতবাদের। ঠিক যেমন ছিল কুলেশভের 'ফিল্ম্ উইথদাউট ফিল্ম্'। কি সে নতুন যুগ? এতদিন হলিউড থেকে টলিউড সবটাই ছিল স্টুডিওর ভিতরে সাজানো গোছানো ছবির 'সেট'। রঙিন টেলিফোন, বাথটবে পুতুল-পুতুল নায়িকা। পটে আঁকা কল্পলোকের ছবি। স্বপ্নের জগৎ।

'রোম : ওপেন সিটি'র সাফল্যের পর সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার জাভাতিনি স্লোগান তুললেন স্টুডিওর অন্দরমহল থেকে ক্যামেরাকে রাস্তায় নামাও। ক্যামেরা পথ চলুক রাস্তায়, শ্রমিক বস্তিতে, কাফেতে, মানুষ যেখানে থাকে সেখানে—অবশ্য 'জুম' করুক গরিব মানুষের দিকে, না, মার্সেডিজের দিকে নয়, বাইসাইকেলের দিকে। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হতমান মানুষরা হল সিনেমার নায়ক-নায়িকা। চিত্রনাট্য খুঁজে বেড়াক সেইসব মানুষদের বাস্তব জীবনে যেমন ঠিক তেমনই। তারকা নয়, রঙিন ছবি নয়, উপজীব্য

Scanned by Scanner Go

বিষয় হল মধ্যবিত্ত আর গরিব মানুষের পৃথিবী। তাকে সাদাকালোতে দেখালেন। রঙিন ছবির স্বপ্নিল হাতছানি উপেক্ষা করে।

এল চলচ্চিত্রের নতুন যুগ। 'নব্যবস্তুবাদের' যুগ। চলচ্চিত্রের জগতের সবচেয়ে জোরালো তত্ত্ব। জানি চলচ্চিত্র পঞ্চাশের দশকে নব্যবস্তুবাদের তত্ত্বকে পেরিয়ে নবতর তত্ত্বের দিকে ছুটে চলেছে অবিরাম। তবু চলচ্চিত্রের প্রথম নিজস্ব তত্ত্ব হিসাবে আজও নব্যবস্তুবাদ স্বীকৃত।

নব্যবস্তুবাদের দুনিয়াজোড়া স্বীকৃতি 'বাইসাইকেল থিভ্‌স'-এর জন্য। ভিত্তোরিও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিভ্‌স' চলচ্চিত্র ইতিহাসের প্রথম দশটির অন্যতম বলেই নয়, পরবর্তীকালের চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে ছবিটি।

এই পর্যায়ে ডি সিকার প্রথম ছবি 'শু সাইন'। চিত্রনাট্যকার জাভাতিনি। ছবির নায়করা হল কিশোর বুটপালিশওয়ালারা। পরাজিত রোমের রাস্তায় তারা মার্কিনি সৈন্যদের পা টেনে ধরে, 'বুটপালিশ, বুটপালিশ'। এই অপমানকর জীবনের ভিতরেও আছে স্বপ্ন। এই জীবন আর স্বপ্ন নিয়েই তৈরি 'শু সাইন'। উনিশশো ছেচল্লিশে তৈরি। এর দু'বছর পরে অর্থাৎ উনিশশো আটচল্লিশে তৈরি 'বাইসাইকেল থিভ্‌স'। এক বেকার শ্রমিক রোমে পোস্টার সাঁটার কাজ পায়। একদিন কাজ করতে করতে তার বাইসাইকেলটা চুরি যায়। বাইসাইকেলটি তার কাজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। পুলিশ কোনো সাহায্য করে না। মরিয়া হয়ে সে একটি সাইকেল চুরি করে। কিন্তু সে এ বিষয়ে একেবারেই দক্ষ নয়। সুতরাং সে ধরা পড়ে। লাঞ্ছিত হয় শিশুপুত্রের সামনেই। আর লাঞ্ছনার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে শিশুপুত্রের মুখোমুখি হওয়া। শেষ দৃশ্যে অবশ্য বাবা আর ছেলের সমঝোতা হয়। দুজনে একাত্ম হয়ে ওঠে। সংগ্রামী গরিব মানুষদের অসহায়তা এবং ভেঙে না পড়ার অসাধারণ দলিল 'বাইসাইকেল থিভ্‌স'। একটি দৃশ্যের উল্লেখ করছি। স্টেডিয়ামে ফুটবল ভাঙা দর্শকদের সামনে ফুটপাতে বসে বাবা আর ছেলে। ফুটবল নয়। জনারণ্য নয়। তাদের চোখ নিজেদের সাইকেলের দিকে। না পাওয়ার অসহায়তা দর্শকদের যেন অসহায় করে তোলে। আজ কত দশক পেরিয়ে এসেছি। তবু আজও 'বাইসাইকেল থিভ্‌স'-এর আবেদন সমানভাবেই নাড়া দেয় আমাদের।

'বাইসাইকেল থিভ্‌স'-এর অভিনেতারা ছিলেন একেবারেই আপেশোদার। নায়কের ভূমিকায় বাস্তবেই এক কাজ হারানো বেকার শ্রমিক, আর তার শিশুপুত্র। শিশুটির অভিনয় 'দি কিডের' শিশুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বাইসাইকেল থিভ্‌স' নব্যবস্তুবাদের শুধু চিত্ররূপ নয়, যুদ্ধবিরোধী মানবতাবাদের সংগ্রামী দর্শনের দলিল।

স্বভাবতই সেদিনের ইতালীর সরকারের কাছে রাজাসন পাননি ডি সিকা,

Scanned by Scanner Go

ভিসকন্তি, পাসোলিনি, রসোলিনিরা। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তাঁদের বরণ করে নিয়েছিল। ডি সিকাও পরোয়া করেননি। একের পর এক ফ্যাসিস্ত বিরোধী যুগান্তকারী চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'টু উইমেন' বা 'উইমেন অব রোম' তার জ্বলন্ত নিদর্শন আর পৃথিবীর বাড়তি লাভ হয়েছিল মার্সেলার মাস্ত্রোয়ানি বা সোফিয়া লোরেনের মতো অভিনয় প্রতিভা।

'বাইসাইকেল থিভ্‌স' যদি নব্যবস্তুবাদের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হয়, তাহলে যে নব্যবস্তুবাদী ছবিটি আজও ইতিহাসের দলিল হয়ে আছে সেটি হল 'পথের পাঁচালী'। যদিও ইতালীর নব্যবস্তুবাদের সরাসরি অনুকরণ সত্যজিতের ছবিতে অনুপস্থিত। নব্যবস্তুবাদের ভারতীয় রূপ পাই সত্যজিতের ছবিতে। প্রায় সব ছবিতে। ডি সিকা নব্যবস্তুবাদের প্রধানতম প্রবক্তা, সত্যজিৎ রায় নব্যবস্তুবাদের শেষতম প্রতিনিধি। ইতালীয় রেনেসাঁর সব লক্ষণ যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে পাওয়া যায় না, তেমনই ডি সিকার পথে বা নব্যবস্তুবাদী ব্যকরণের পথে হাঁটেননি সত্যজিৎ। সব প্রতিভাই যে নিজস্ব আলোয় ভাস্বর।

ভিসকান্তি লা টেরা ট্রেপয় সিসিলির মৎস্যজীবীদের জীবনকে উপজীব্য করলেন। এই ছবি ছিল তাদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ আর তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি। ডি সিকা আর ভিসকন্তি দু'জনের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হল মিরাকল ইন মিলান। ১৯৫০-এ। ডি সিকার 'উমবার্তো ডি' (১৯৫২) নব্যবস্তুবাদী মতবাদ বিধৃত শেষ ছবি। উমবার্তো ডি এক অসুস্থ বৃদ্ধের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের কাহিনি। কাহিনি বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। সুতরাং সেদিনের ইতালির সরকার ছবিটিকে পছন্দ করেননি। ডি সিকা সরকারের স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত হলেন।

ইতালির অপর দুই পৃথিবীখ্যাত পরিচালক আন্তোনিয়নি আর ফেলিনিও নব্যবস্তুবাদের ধারায় হেঁটেছিলেন একদিন। ফেলিনির ভুবন বিখ্যাত সাড়ে আট (8 and $^{1}/_{2}$) আর আন্তেনিয়নির ইল গ্রিদো নব্যবস্তুবাদী আঙ্গিকে নির্মিত। অবশ্য দুজনেই নব্যবস্তুবাদী ধারা থেকে পরবর্তীকালে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তাঁরা চলচ্চিত্রকে শিল্পমাধ্যমের শক্তিশালী হাতিয়ার মনে করে এসেছেন। কিন্তু নব্যবস্তুবাদকে নয়। আর ডি সিকাকে হাতছানি দিল 'মেনস্ট্রিম'-এর জৌলুস। যদিও তাঁর টু উইমেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী চলচ্চিত্রের মরণজয়ী ফসল। ডি. সিকার পক্ষেও আর অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনের পক্ষেও।

চলচ্চিত্র ধারায় নব্যবস্তুবাদের অবদান অনেক। বাস্তবতার খুঁটিনাটি চলচ্চিত্রের ভাষায় যাকে বলে 'ডিটেলস' তার প্রতি নব্যবস্তুবাদীরা অতিমনস্ক ছিলেন। শ্যুটিং ছিল রাস্তায়, বস্তিতে, পোড়ো বাড়ির আঙিনায়। ফলে কাহিনিচিত্রের

Scanned by Scanner Go

ভিতরেও প্রামাণ্য চিত্রের পরিবেশ তৈরি করা শিখিয়েছেন পরবর্তীকালের চলচ্চিত্রকে। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদিও রঙিন ছবি তখন হলিউড আর ইয়োরোপের বাজার মাত করছে, কিন্তু নব্যবস্তুবাদীরা সাদা কালোতেই ছবি তুলতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ তাঁদের কাহিনির চরিত্ররা ছিল মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত মানুষজন। রঙিন ছবি যেন এই নিষ্করুণ দারিদ্রের উপর স্বপ্নের প্রলেপ এঁকে দেয়। বাস্তবতা থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাঁদের ক্যামেরা গতিও ছিল নৈর্ব্যক্তিক। কাহিনি উপস্থাপনা ছিল সহজ-সরল রেখায়। ক্যামেরা ব্যবহারও ছিল জটিল কোণ বর্জিত। কেননা তাঁদের লক্ষ্য ছিল কোনোভাবেই যেন নাটকীয়তা ছবিকে প্রভাবিত না করে।

নব্যবস্তুবাদ থেকে নতুন ধারায় নির্মিত ফেদিরিকো ফেলিনির (১৯২০-৯৩) যে ছবি আমাদের প্রথম আলোড়িত করে সেটি হল লা দোলচে ভিটা। ১৯৬০-এ নির্মিত। আর সহজ সরলভাবে নির্মিত নয়। এক সাংবাদিকের চোখে রোমের অলস ধনীদের বিলাস আর বিকৃত জীবনের ব্যঙ্গমুখর ছবি। পাশাপাশি জটিল আঙ্গিকে যেন রোমেরই আত্মানুসন্ধান করেছে ছবিটি। সমাজমনস্কতা ফেলিনির সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ইতালির সীমানা ছাড়িয়ে নব্যবস্তুবাদ ইয়োরোপের দেশে দেশে প্রভাব ফেলেছে। ব্রেসঁর নির্মম বাস্তবতা (Stark Realism) আর তার দলিল 'আ আজার বেলথাজার' নব্যবস্তুবাদেরই আরেক রূপ।

ষাটের দশকে নব্যবস্তুবাদ কোন ফল্গুধারায় হারিয়ে গেল। তাঁরা দেখিয়েছেন সত্য, কিন্তু সে দেখা সমাজে যেমনটি আছে তেমনটিই। যেমনটি হওয়া উচিত তার কোন ইঙ্গিত তাঁরা দেননি। আজকের সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ইত্যাদি জটিল পরিবেশে তাঁদের অতি সরল বীক্ষণ যেন সেই নদীর মতো যে মরুপথে হারিয়ে যায়। এবং রেখে যায় তার পদচিহ্ন।

নব্যবস্তুবাদও রেখে গেছে।

নবতরঙ্গ

পঞ্চাশের দশকে বিখ্যাত ফরাসি শিল্পসমালোচক আন্দ্রে বাজিন (ফরাসি উচ্চারণ বাঁজা) একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন—'কাহিয়্যে দ্যু সিনেমা' (Cahiers du Cinema)। এই পত্রিকায় তিনি চলচ্চিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক দিক নিয়ে অত্যন্ত মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গদার তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, সে সময় একটি চিত্রনাট্য রচনা করার তুলনায় 'কাহিয়্যে'তে প্রবন্ধ প্রকাশ দুরূহতর ছিল। পত্রিকার লেখককুলদের মধ্যে দেখতে পাই ত্রুফো, গদার,

Scanned by Scanner Go

লুই মাল, আল রেঁনে, শ্যাব্রলদের, যাঁরা উত্তরকালে পৃথিবীখ্যাত চলচ্চিত্রকার হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'কাইয়ে'তে তাঁদের প্রধান অস্ত্র ছিল কলম, চলচ্চিত্রে তাই রূপান্তরিত হল ক্যামেরায়। প্রকৃতপক্ষে, ফরাসি 'ন্যুভেলভাগ' বা নবতরঙ্গের জন্ম স্টুডিও চত্বরে নয়। কাইয়ের সম্পাদকীয় দপ্তরে।

ফ্রান্সে জঁ পল সার্ত্র ব্যবহৃত উপন্যাসের ধারা এক নূতন নাম অর্জন করে ন্যুভো রোয়াঁ। এখানে সময়কে ভেঙে ফেলা হয়। সময় যেন বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে মনোজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, ছবিও এই মানস নির্ভর আঙ্গিকে নির্মিত হল। নায়কের সঙ্গে নায়িকার দেখা হয়েছিল কবে? গত বছর নাকি তার আগের বছর? নাকি অন্য কোনো সময়ে অন্য কোনোখানে? অস্তিত্ববাদী দর্শনের মতই প্রশ্ন আছে উত্তর নেই। সমস্যা আছে, মীমাংসার দিকে তার দৃষ্টি কখনো নিবদ্ধ হয় না। বিষয়ে এবং রাজনৈতিক দর্শনে ত্রুফো, গদার বা আলা রেঁনের দুস্তর পার্থক্য। কথা বলার ভঙ্গিমাতেও। তারই মধ্যে আমাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে হয়। বিষয়ের ক্ষেত্রে নবতরঙ্গের চলচ্চিত্রকাররা নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই কেন্দ্র করেছেন। যেমন ত্রুফো 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ'-এ নিজের হতমান কৈশোরকে, গদার তাঁর মাওবাদী নাগরিক দর্শনকে। প্রত্যেকেই কমবেশি অস্তিত্ববাদ আর নুভো রোমাঁ বা নব উপন্যাসের ধারার প্রভাবে প্রভাবিত। মূলত অপেশাদার অভিনেতা দিয়ে, যথাসম্ভব কম খরচে স্টুডিওর বাইরে লোকেশনে শ্যুটিং করেছেন। প্রত্যেকেই হাল্কা ওজনের হাতে ধরা ক্যামেরা (hand held), কাঁধে ঝোলানো টেপ রেকর্ডার, আর অতি সংবেদনশীল (ultra sensitive) নেগেটিভ ব্যবহার করেছেন। অল্প আলোয় ছবি তুলেছেন। ক্যামেরাকে নানানভাবে ব্যবহার করেছেন। কখনো ত্রুফোর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ'-এর শেষ শটের মতো দশ মিনিট ব্যাপী শট নিয়েছেন, কখনো বা জাম্পকাট। আইজেনস্টাইনের মন্তাজ তত্ত্বর আধুনিকতম রূপ নিয়েছে নবতরঙ্গের পরিচালকদের হাতে। কিন্তু মূল সীমাবদ্ধতা হল অস্তিত্ববাদে আক্রান্ত চলচ্চিত্রকার কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা নৈতিক মানদণ্ড গ্রহণ করেন না, সব কিছুই ছেড়ে দেন দর্শকদের উপর। যেন চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্য তাঁর নিজের কিছুই বলার নেই। অস্তিত্ববাদী নৈর্ব্যক্তিকতার চূড়ান্ত রূপ হল 'নবতরঙ্গ'।

ত্রুফোর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ' দিয়ে নবতরঙ্গের পথ চলা শুরু। উনিশশো উনষাটে কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেন। নায়ক এক সংশোধনী স্কুলের কিশোর আঁতোয়া। আঁতোয়া এক কৈশোর হারানো, সরলতা হারানো অপরাধজগতের চোদ্দো বছরের ছেলে। শেষ দৃশ্যে সংশোধনী স্কুল থেকে পালিয়ে কিশোর আঁতোয়া বহু পথ দৌড়ে অবশেষে সমুদ্রের তীরে এসে থমকে দাঁড়ায়। তারপর ফিরে দাঁড়ায়। ক্যামেরা তাকে

Scanned by Scanner Go

'ফ্রিজ' করে। পালাবার পথ নেই। এই শটটিকে নিয়ে আগে অনেক কথা বলেছি।

ত্রুফোর অপর গুরুত্বপূর্ণ ছবি 'Jules et Jim'—জুলে এবং জিম। ত্রিকোণ প্রেম ছবির বিষয়বস্তু। এখানে ক্যামেরার অস্থির বিচরণ অনেক স্থিতি পেল। এক সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে—কাহিনিটি বলা হল যদিও নব উপন্যাসের ভঙ্গিমায়।

তীব্রভাবে রাজনীতিকে উপজীব্য করেছেন গদার। নব তরঙ্গের সবচেয়ে বিতর্কিত, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকার জঁ লুক গদার। গদার সরাসরি মাওবাদী। 'আলফা ভিল' (১৯৬৫) 'মাসকুলিন ফেমিনিন' (১৯৬৬), মেড ইন ইউ. এস. এ' (১৯৬৬)—ছবিগুলিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এমনকী দেশের শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী আকর্ষণকে তীব্র আক্রমণ করেছেন গদার। চে. গুয়েভারা, গদার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ভালবাসার মহৎ অনুভূতি নিয়ে চালিত এক খাঁটি বিপ্লবী।' ৬৮-র ছাত্রবিপ্লবের পূর্বাভাস পাই লং মার্চ (১৯৬৭) ছবিটিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন ছাত্রছাত্রী ছুটিতে বেরিয়েছে লং মার্চে। এ এক প্রতীকী লং মার্চ। তারা মুখোমুখি হচ্ছে অন্ধ জাতীয়তাবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের, শ্রেণি শোষণের। জঁ লুক গদারকে আজও বিপ্লবের প্রেরণা বলা হয়। যেমন জঁ পল সার্ত্রকে ভলতেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গদার ছবিকে জটিল করে তুলেছেন। দর্শকদের বুদ্ধিকে ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছেন। তবু কথা থেকে যায়, গদারের চরিত্ররা সবাই যেন মূল ছাড়া। পারিবারিক জীবন বা পারিবারিক সম্পর্ক গদারের ছবিতে প্রায় অনুপস্থিত। ছবিতে গ্রাম নেই, গ্রামের মানুষ নেই, সবই নাগরিক। আর নাগরিক বিচ্ছিন্নতার শিকার। সবাই পণ্য। তাই গদারের ছবিতে প্রায় অনিবার্যভাবে বেশ্যাবৃত্তি দেখা যাবেই। তবু গদার আজও আধুনিক প্রতিষ্ঠানবিরোধী চলচ্চিত্রকারদের প্রেরণা।

জঁ লু গদার জন্মেছিলেন ১৯৩০-এ। কাইয়ের পাতায় তাঁর আত্মপ্রকাশ চলচ্চিত্র সমালোচক হিসাবে। তাঁর প্রথম ছবি 'ব্রেথলেস'। ১৯৫৯-এ তৈরি। ত্রুফোর কাহিনি এই ছবিটিকেই নবতরঙ্গের সূচনা বলে মনে করেন।

নিজের ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে গদার বলেছেন, 'সুন্দর আর সত্যের দুটি দিক একটি বাস্তব অপরটি কল্পনা। যে কোনটি দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। আমার শুরুর জায়গা হল বাস্তব।' আর এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি একজন প্রাবন্ধিক। আমি প্রবন্ধের আঙ্গিকে চলচ্চিত্র নির্মাণ করি (গদার অন গদার)।' আসলে গদার একজন রাজনৈতিক শিল্পী। তাঁর মতে তাঁর আঙ্গিকের জটিলতা এই সমাজের বুর্জোয়া বাস্তবতার জন্য। বুর্জোয়া সৃষ্ট বাস্তবতা ভাঙতে প্রয়োজন প্রচলিত ফর্মকে ভেঙে খান খান করা।

কিন্তু গদার নিজেকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলেন না। তিনি নিজেকে মাওবাদী বলে প্রচার করেন। অবশ্য আধুনিক সমালোচকদের মতে তাঁর বক্তব্য

Scanned by Scanner Go

মাওবাদ আর অস্তিত্ববাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ আর কোনো মতবাদেই তিনি সুস্থিত নন। তিনি বলছেন 'আমি বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান। এবং পলায়নবাদী। অন্য কেউ এল. এস. ডি, মারিজুয়ানার জগতে পালাত। আমি ছবির জগতে। আর আজ মনে হচ্ছে ছবির পৃথিবী আরো বেশি বুর্জোয়া।' (গদার অন গদার)

গদারের ছবিতে পরিবার নেই। শিশু নেই। কিন্তু অসামান্য দক্ষতায় বহির্জগত আর মনোজগতে বিচরণ করেছেন। তাই গদার আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক।

নবতরঙ্গের যে ছবিটি একদিন বিশ্বজোড়া নজর কেড়েছিল সেটি হল 'হিরোসিমা মুন আমুর।' এক ফরাসি অভিনেত্রী জাপানে এসেছেন। যুদ্ধের সময় তিনি অধিকৃত ফ্রান্সে এক জার্মান সৈনিকের প্রেমিকা। জার্মান সৈনিকটি যুদ্ধে মারা যায়। এদিকে জাপানে এসে এক জাপানি যুবকের সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগাযোগ। যুবকটির ভিতরে হিরোসিমার আণবিক বিস্ফোরণের ভয়ংকর স্মৃতি। আর স্বজন হারানোর বেদনা। যুদ্ধ দু'জনের বুকের গভীরে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে। সেই ক্ষতচিহ্ন যেন মোছা যায় না। আজও। আলা রেনেঁর 'হিরোসিমা মুন আমুর' যুদ্ধবিরোধী মানবতাপ্রেমী ছবির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

নবতরঙ্গ আঙ্গিক সময়কে ভেঙে ফেলে। বাইরের জগত গৌণ, মনোজগৎই মুখ্য। আলা রেনেঁর নায়ক তাই মনে করে নায়িকার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল গত বছর। নাকি অন্য কোনোদিন অন্য কোনোখানে। আর এই প্রশ্নের উত্তর ছবিতে নেই। দর্শকরা খুঁজে নিন তার উত্তর। ছবির নাম 'লাস্ট ইয়ার ইন মারিয়েনাবাদ' (Last year in Marienabad)। 'একদিন প্রতিদিনে' মৃণাল সেন ছবি শেষ করেন নায়িকার প্রত্যাবর্তনে। কিন্তু সারাদিন বিকেল গড়িয়ে রাতে সে কোথায় ছিল? উত্তর নেই। দর্শক খুঁজে নিক উত্তর। নবতরঙ্গ অস্তিত্ববাদকে বরণ করে নিল।

ত্রুফো থেকে গদার, শাব্রল থেকে আলা রেঁনে—আপাতদৃষ্টিতে কারোর সঙ্গে কোথাও যেন কোনো সাযুজ্য নেই। কিন্তু মিল আছে। সে বিষয় বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানে। প্রত্যেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন। ত্রুফোর কৈশোরকালে। গদারের অতীত পারিবারিক নাগরিক ঐতিহ্য। আলা রেঁনের যুদ্ধের স্মৃতি।

আর একটি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হল 'মন্তাজ' আর মিস-এন-সিনের আপাত বিপ্রতীপ কোণের মধ্যে তাঁরা এক সমন্বয় এনেছেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই নব্যবস্তুবাদের এক চঞ্চল অস্থির রূপ হল নবতরঙ্গ।

নবতরঙ্গের সীমাবদ্ধতা ফরাসি মানসিকতার সীমাবদ্ধতা। অস্তিত্ববাদ আর মার্কসবাদের দোলাচলে দীর্ণ ফরাসি বিবেক, নবতরঙ্গ তার থেকে মুক্তি নয়।

Scanned by Scanner Go